❖ মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে অনুবাদ সাহিত্যের গুরুত্ব আলোচনা করো।

তমাল কান্তি পাল

বাংলা বিভাগ,ডোমকল কলেজ।

অনুবাদের মধ্য দিয়ে সংস্কৃত কাব্য- মহাকাব্য (Epic) ও পুরান (১৮) মধ্যযুগের বাংলাকাব্য কে যে ক্লাসিক মহিমা দিয়েছে তা প্রথমেই বলে নেওয়া ভালো। রামায়ণ- মহাভারত- ভাগবতের অনুবাদ না থাকলে বাংলা কাব্য শুধুমাত্র গ্রাম্য সাহিত্য হয়েই থাকত। উচ্চতর মর্যাদা কোনোদিনই লাভ করতে পারত না। সংস্কৃতে রচিত রামায়ণ, মহাভারত, ভাগবত এবং অন্যান্য পুরান গ্রন্থের বঙ্গানুবাদ কে অনুবাদ সাহিত্যের অন্তর্ভুক্ত করা হয়। বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে ত্রয়োদশ থেকে চতুর্দশ শতাব্দি পর্যন্ত (১২০০-১৩৫০) কোনোরূপ প্রামাণ্য নিদর্শন পাওয়া যায় না। তুর্কি আক্রমণের ফলে বাঙালি জীবন একেবারে বিধ্বস্ত হয়ে পড়েছিল। বাংলা সাহিত্যে প্রায় দেড়শ বছর ধরে একটা অন্ধকার পর্ব চলেছিল। এই পর্যায়ে কোনোরূপ সাহিত্যের লিখিত নমুনা পাওয়া যায় না। তাছাড়া প্রাচীন যুগের সমাপ্তি এবং মধ্যযুগের সূচনাকাল এই যুগটিকে 'অন্ধকারময় যুগ' বা 'শূন্যতার যুগ' বলে চিহ্নিত করেছেন। বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসের এক নতুন দিগন্তের সূচনা হয়েছিল, অনুবাদ সাহিত্যের হাত ধরে। সংস্কৃত রামায়ণ, মহাভারত, ভাগবত বাংলা এবং অন্যান্য প্রাদেশিক ভাষা ও অনুবাদ করা হয়েছে। বাংলায় যেমন- কৃত্তিবাসী রামায়ণ, কাশীরাম দাসের মহাভারত, মালাধর বসুর শ্রীকৃষ্ণ বিজয় অনুবাদ সাহিত্যের এক উল্লেখযোগ্য দৃষ্টান্ত।

রামায়ন:- রামায়ণ কাহিনীর প্রতি বাঙালির প্রবল আগ্রহ ছিল। প্রাক্- তুর্কি আমলেও দুজন বাঙালি কবি রামায়ণ কাহিনী অবলম্বনে সংস্কৃত ভাষায় কাব্য রচনা করেছিলেন। অভিনন্দ ও সন্ধ্যাকর নন্দীর সেই দুই রামায়ণে মূল থেকে সময়োপযোগী পরিবর্তন ঘটানো হয়েছিল। বাঙালি পাঠক রামায়ণের কাহিনীটির বীর্য- কঠোর অংশকেও সহজেই কোমল করে নিতে পেরেছিল, আপন প্রবণতা ও চরিত্র অনুযায়ী। রামায়ণের অনুবাদে কৃত্তিবাস মধ্যযুগের বাংলা অনুবাদ ধারার প্রথম কবি এবং গোটা প্রতিষ্ঠা পর্বের পূর্বপ্রান্তে আমি দাঁড়িয়ে আছেন। পূর্ববঙ্গের বেদানুজ মহারাজার পাত্র ছিলেন নরসিংহ ওঝা। সেখানে প্রমাদ উপস্থিত হলে তিনি পশ্চিমবঙ্গে আসেন।কৃত্তিবাস পশ্চিমবঙ্গের গঙ্গার তীরে অবস্থিত ফুলিয়া গ্রামে বসবাস করতে থাকেন। নরসিংহ থেকে কৃত্তিবাস পঞ্চম পুরুষ। তাঁর পিতার নাম বনমালী, মাতার নাম মালিনী। মাইকেল মধুসূদন দত্ত কৃত্তিবাস কবি কে-" এ বঙ্গের অলংকার" বলে আখ্যায়িত করেছেন। কথাটি অতিশয় যুক্তিসঙ্গত। বিদ্যার্জনের পরে গৌড়েশ্বরের সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে যান। সাতটি শ্লোক লিখে রাজাকে সংবর্ধনা জানান। সভা শেষ হলে রাজা তাঁকে আহ্বান করেন। কৃত্তিবাসের শ্লোক শুনে খুশি হয়ে রাজা তাঁকে মাল্যচন্দনে বরণ করেন এবং পট্টবস্ত্র উপহার দেন। রাজা কর্তৃক সম্মানিত কৃত্তিবাস অবশেষে সপ্তকান্ড রামায়ণের অনুবাদ করেন। কৃত্তিবাসের আত্মবিবরনটি কবি জীবনের কিছু সংবাদ বহন করে। কবি তাঁর নিজের জন্ম সালকে একটি নির্দিষ্ট কালজ্ঞাপক পংক্তিতে উল্লেখ করেছেন-

" আদিত্যবার শ্রী পঞ্চমী পূর্ণ মাঘমাস।
তথিমধ্যে জন্ম লইলাম কৃত্তিবাস।।"

কৃত্তিবাস অনুদিত রামায়ণ (১৮০২-১৮০৩খ্রিঃ) শ্রীরামপুরের খ্রিস্টান মিশনারি উইলিয়াম কেরির উদ্যোগে মুদ্রিত হয়। কৃত্তিবাসের বাঙালির গৃহকর্ম ও গার্হস্থ জীবনের কাহিনি স্মরণ করিয়ে দেয়। অন্যান্য রামায়ণের অনুবাদকের মধ্যে ছিলেন- মহিলা কবি চন্দ্রাবতীর রামায়ন, অদ্ভুত আচার্যের রামায়ণ, দ্বিজ হরিচরণের রামায়ণ, রামানন্দ ঘোষের রামায়ন,রঘুনন্দন গোস্বামীর রামরসায়ন।

মহাভারত:- বাল্মিকি রামায়ণের মতো ব্যাসদেব বা বেদব্যাসের মহাভারত ও অনুদিত হয়েছিল। মহাভারতের আদি অনুবাদক কবীন্দ্র পরমেশ্বর এবং শ্রীকর বা শ্রীকর নন্দী চট্টগ্রামের মুসলমান শাসনকর্তাদের সভাকবি ছিলেন। বাংলায় মহাভারতের শ্রেষ্ঠ অনুবাদক ছিলেন কাশীরাম দাস। অনুমান করা যায়, তিনি সপ্তদশ শতকের (১৬০২-১৬১৩ খ্রিঃ) প্রথম দশকে তিনি

মহাভারতের অনুবাদ করেন। এর মাধ্যমে অনুমান, কবি সপ্তদশ শতকের প্রথম দিকে ভারত পাঞ্চালি রচনা শুরু করেন। এই শুরুর ইতিহাস যেমন অজ্ঞাত, তেমনি শেষের পরিচয় অজানা। কারণ কোন কোন পুঁথিতে পাওয়া গেছে এইসব শ্লোক:-

" আদি সভা বন বিরাটের কতদূর।
ইহা লিখি কাশীদাস গেলা স্বর্গপুর।।"

সংস্কৃত মহাভারতের মত বিশাল কাহিনি, উচ্চতর জীবনের আদর্শ, শ্রীকৃষ্ণের মহিমা এসবই কাশীরাম দাসের অনুবাদে খুবই সহজ হয়ে উঠে এসেছে। মহাভারত অনুবাদ রামায়ণের মতো বাংলা সাহিত্য কে এক বিশাল সমৃদ্ধশালি করে তুলেছে। তাছাড়া মহাভারতের অন্যান্য অনুবাদকের মধ্যে ছিলেন-কবীন্দ পরমেশ্বরের মহাভারতের অনুবাদ, শ্রীকরনন্দীর মহাভারতের অনুবাদ,ছুটি খাঁর মহাভারত ইত্যাদি।

ভাগবত:- ভাগবত অনুবাদের ধারাটি রামায়ণ-মহাভারত অনুবাদের তুলনায় অনেকক্ষীণ। এই ধারার আরম্ভটি তাৎপর্যপূর্ণ। বাংলা অনুবাদের ক্ষেত্রে চিহ্নিত হবার মতো বিশিষ্ট। কিন্তু চৈতন্য প্রভাবে পরবর্তীকালে ভাগবত অনুবাদের স্থানে নূতন কাহিনী কাব্যের প্রচলন ঘটল। মধ্যযুগের ভাগবতের প্রথম ও শ্রেষ্ঠ অনুবাদক মালাধর বসু। তাঁর অনুদিত গ্রন্থের "শ্রীকৃষ্ণবিজয়" ভাগবতের দশম ও একাদশ স্কন্দের সরল সংক্ষিপ্ত অনুবাদ করেছিলেন।

" তেরশ পঁচানই শকে গ্রন্থ আরম্ভন।
চতুর্দশ দুই শকে হৈল সমাপন।।"

কবির জীবন সম্পর্কে প্রাপ্ত তথ্য তেমনভাবে পাওয়া যায় না। মালাধর বসুর পৃষ্ঠপোষক ছিলেন রুকনউদ্দিন বরবক্ শাহ্ (১৪৫৯-৭৪ খ্রি:)। কবি লিখেছেন:-" গৌড়েশ্বর দিল নাম গুনরাজ খান।" কবির নিবাস ছিল বর্ধমান জেলার কুলীনগ্রামে। শ্রী পিতার নাম ভগীরথ, মাতার নাম ইন্দুমতী। পরবর্তী বাংলার বৈষ্ণব সমাজে "শ্রীকৃষ্ণ বিজয়" কাব্য যথেষ্ট প্রভাব ফেলেছিল। বৈষ্ণব ধর্ম প্রচারে কাব্যটির বিশেষ সার্থকতা আছে। চৈতন্যদেবের আবির্ভাবের কয়েক বছর আগে মালাধর ভাগবতের দুই স্কন্ধের সরল ভাবানুবাদ করে "শ্রীকৃষ্ণ বিজয়" বা "শ্রীকৃষ্ণ মঙ্গল" রচনা করেন। মালাধরের কাব্যে পরবর্তী বৈষ্ণব ধর্মের পূর্বাভাস কেউ কেউ আবিষ্কার করতে চেয়েছেন। "বসুদেব সুত পুত্র মোর প্রাণনাথ" চরণটিকে বিচ্ছিন্নভাবে গ্রহণ করে চৈতন্যদেব ভাব-বিহ্বলতা অনুভব করতেন। কিন্তু মালাধরের ভক্তি সম্পূর্ণত ভাগ বতাশ্রয়ী। সেই বৈধী ভক্তির সঙ্গে গৌড়ীয় বৈষ্ণবদের রাগানুকা প্রেম ভক্তির স্বরূপ গত পার্থক্য রয়েছে। কৃষ্ণের ঐশ্বর্যময় রূপকে মুখ্যভাবে গ্রহণ করে তত্ত্বাশ্রয়ী ভক্তির কথাই কবি বলেছেন।পঞ্চদশ শতাব্দীতে বাংলা সাহিত্যের উৎসব মুখ খুলে গেলেও জোয়ার আসে আরো কিছুদিন পরে। সেই জোয়ারে বাঙালি জীবনে এক নতুন প্রেরণা ও উদ্দীপনা সৃষ্টি করে।

সহায়ক গ্রন্থাবলী:-

১. বাংলা সাহিত্যের সমগ্র ইতিহাস- ক্ষেত্র গুপ্ত।
২. বাংলা সাহিত্যের সম্পূর্ণ ইতিবৃত্ত:- অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়।
৩. বাংলা সাহিত্য পরিচয়:- পার্থ চট্টোপাধ্যায়।